জেমকন তরুণ কথাসাহিত্য পুরস্কার ২০১১
প্রাপ্ত গল্পগ্রন্থের যুগপূর্তি সংস্করণ

অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ

মুম রহমান

ঐতিহ্য

লেখা পড়ি
খুব কাছের মনে হয়
লেখক ও লেখাকে আপন মনে হয়
তবু দূর থেকে তাকে দেখি
অত বড় নক্ষত্রকে দূর থেকেই দেখতে চাই
কাছে গেলে যদি ওই জ্যোতিতে ঝলসে যাই
ভয় হয়।

আমাদের সময়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র
প্রিয় কবি, লেখক
সৈয়দ শামসুল হক
আপনার জন্য এই
'অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ'।

যুগপূর্তি সংস্করণ প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের আছে 'গল্পগুচ্ছ'। সে গল্পগুচ্ছ আমাদের আলো দেখায়। কিন্তু আমি বসবাস করেছি এক অন্ধকার সময়ে। খুন, হত্যা, গুম, ধর্ষণ, প্রতারণা, নির্যাতন দেখেছি অনেক। কখনো কোনো কোনো অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরেছে, কখনো দূর থেকেই ভয় পেয়েছি এই সব অন্ধকার দেখে। আমি তো আর কিছু পারি না, কথা বুনতে পারি। অক্ষর, শব্দ, বাক্যের জগতে নিজেকে ছড়াতে পারি। সেটাই করেছি 'অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ' শিরোনামের গল্পগুলোতে।

এই সব গল্পের জন্য আমি ২০১১ সালে জেমকন তরুণ কথাসাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলাম। বন্ধু শামীম রেজার অনুপ্রেরণা এবং হুমকি-ধমকিতেই পাণ্ডুলিপি গোছাতে পেরেছিলাম। বলা যায়, তার সুবাদেই পাণ্ডুলিপি তৈরি। সেই পাণ্ডুলিপির জন্য কথাসাহিত্য পুরস্কার পাওয়া আমার সাহিত্য জীবনের একটা বড় প্রাপ্তি। প্রথমত পুরস্কারের টাকার অঙ্ক, দ্বিতীয়ত প্রথম বইটি ছাপা হওয়ার আনন্দ। আমাদের দেশে বহু তরুণ লেখককেই নিজের টাকায় বই ছাপতে হয়, প্রকাশকের পেছনে ঘুরতে হয়, পত্রপত্রিকায় লেখা ছাপতে গেলেও সম্পাদকের সামনে-পেছনে সময় দিতে হয়। আমার এসব কিছুই লাগেনি। আমার প্রথম গ্রন্থ 'বিশ্বসেরা ৫০ চলচ্চিত্র' প্রকাশের সাথে সাথে বিক্রি তালিকার শীর্ষ মানের কাছে চলে যায়। বিষয়ের কারণেই এই বই প্রকাশ করতে প্রকাশককে তেল-ঘি দিতে হয়নি। এই সিরিজের দ্বিতীয় বইও আরামসে প্রকাশিত হয়ে যায়। কিন্তু হতে চেয়েছিলাম লেখক, পরিচিত হয়ে গেলাম চলচ্চিত্র-গবেষক হিসেবে। সে পরিচয় আমার ভালো লাগেনি। ফলে 'অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ'-এর পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং বই আকারে এর প্রকাশ আমার লেখকজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমাকে কখনোই কোনো বই প্রকাশের জন্য কারো কাছে অনুনয়-বিনয় করতে হয়নি। এখন তো মাবুদের কৃপায়, পাঠকের ভরসায় আমি লেখালেখি করেই দুটো ডাল-ভাত খেতে পারি। কখনোবা বার্গার-পিৎজাও খেতে পারি। কোনো কোনো বইয়ের জন্য আগাম টাকা পেয়ে যাই। নিজের ৫০ বছর বয়সে এসে দেখি, আমার ৫১টি বই প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই সবই আমার জীবনের আলোকিত খবর। আর এই সব আলোর সূচনা হয়েছিল 'অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ' দিয়ে। আমাকে যদি কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে, নিজের কোন বইটি সবচেয়ে প্রিয়, আমি নিশ্চয়ই 'অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ'র কথা বলব।

নিজের প্রিয় বইটি প্রিয় প্রকাশনা সংস্থা 'ঐতিহ্য'-এর হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। আরিফুর রহমান নাইম আমার অন্যান্য বইয়ের মতো এটিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে ছাপবেন, সে আস্থা আমার আছে। এ সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি অনন্যা প্রকাশনীর মনিরুল হক ভাইকে। তিনি সজ্জন মানুষ। আমার 'অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ' তিনিই প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। এখন এই নতুন সংস্করণের কালে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলনকে। প্রথম সংস্করণে তিনি নিজে আগ্রহী হয়ে একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। মিলন ভাইয়ের সেই ভূমিকাটা আমি এই সংস্করণেও রাখলাম। আদরকে যত্ন করে রাখার অভ্যাস আমার আছে।

পুরোনো গল্পগুলোর একটা-দুটো বানান ঠিক করেছি, দুয়েক লাইন সংযোজন-বিয়োজন করেছি। 'অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ' ২০১২ সালে প্রকাশিত হলেও এর গল্পগুলো আরো পুরোনো। কোনো কোনো গল্প হয়তো ২০০০ সালে প্রকাশিত। অর্থাৎ প্রায় ২০ বছর আগের লেখা এগুলো। নিজের পুরোনো লেখা পড়তে গেলে দুটো ব্যাপার ঘটে। একটা মন তখন বলে কিসসু হয়নি, নতুন করে লেখো, তখন মনে চায় খোলনলচে সব পাল্টে দিই। আবার আরেকটা মন পুরোনো স্মৃতির মতোই পুরোনো লেখার দিকে আর্দ্র হয়ে তাকায়, ভাবে, আহা, এমনও ছিল, এমন করেও লিখেছি। এই দুই মনের টানাপোড়েনে আমি ভুগেছি। তবে কোনো চরম পন্থা বেছে নিইনি। আমি আমূল কোনো পরিবর্তন করিনি, বরং পুরোনো গল্পগুলোকেই অটুট রেখেছি। তবে দুয়েকটা বাক্য, শব্দ ক্ষেত্রবিশেষে অদল-বদল করেছি। উল্লেখ্য, এক দশক পরে এসে 'অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের এই সংস্করণটিকেই আমি চূড়ান্ত পাঠ হিসেবে মনোনীত করছি।

পাঠক, প্রকাশক, সমালোচক–সবার জন্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

মুম রহমান
ঢাকা ২০২৫

অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ আদি সংস্করণের ভূমিকা

আমি মুম রহমানের গল্পের একজন অনুরাগী পাঠক। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর গল্প পড়ে আমি চমকিত হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি। আমার মুগ্ধতার মাত্রা বেড়ে গেছে তাঁর গল্প পড়ে। ‘কালের কণ্ঠে’র সাহিত্য ম্যাগাজিন ‘শিলালিপি’তে মুমের গল্প ‘সর্বংসহা’ ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়। ওই একই বছর বর্ষশেষ সংখ্যা ‘শিলালিপি’তে গল্পটি আবার পুনর্মুদ্রণ করা হয় শিলালিপিতে প্রকাশিত বছরের শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে। ‘অন্ধকারের গল্পগুচ্ছ’ নতুন লেখকের পাণ্ডুলিপি হিসেবে ‘জেমকন তরুণ কথাসাহিত্য ২০১১’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এই সব তথ্যের মধ্য দিয়ে পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন মুম রহমানের গল্প ইতিমধ্যেই গল্পের বোদ্ধাপাঠক এবং গল্পপ্রেমী মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি হলো এ বছর। এই চার দশকে বাংলাদেশের সাহিত্য অনেকখানি এগিয়েছে। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক–সর্বত্রই বহু মেধাবী লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। এই লেখকেরা নানা রকম ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে, নানা রকম নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সাহিত্য।

বাংলা ভাষার ছোটগল্পগুলো বরাবরই খুব সমৃদ্ধ। বহু স্মরণীয় গল্প লেখা হয়েছে এই ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ একাই লিখেছেন আন্তর্জাতিক মানের অনেকগুলো গল্প। বাংলা ছোটগল্প নিয়ে এই ভাষা বেশ অহংকার করার যোগ্যতা রাখে। এই ভাষার কোনো কোনো লেখক শুধু ছোটগল্পের জন্যই বাংলা সাহিত্যে তাঁদের চিরকালের স্থান করে নিয়েছেন। বাংলা ভাষার ছোটগল্পগুলোকে অনুবাদের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে বাংলা ছোটগল্পের সম্মান অনেক বেড়ে যেত। অনুবাদকদের অবহেলার কারণে সব রকমের যোগ্যতা থাকার পরও বাংলা ছোটগল্প আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হয়নি। বাংলা ছোটগল্পের লেখকদের জন্য এই এক বড় দুর্ভাগ্য।

আবার মুম রহমানের গল্পের দিকে ফিরি। মুমের ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ। চরিত্র চিত্রণে খুবই পারদর্শী তিনি। পরিবেশ বর্ণনায় তাঁর দৃষ্টি ক্যামেরার মতো কাজ করে। সর্বোপরি তিনি গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন আমাদের চারপাশের নিত্যদিনকার পরিবেশ থেকে। ফলে তাঁর গল্প হয়ে ওঠে আন্তরিক এবং সর্বস্তরের পাঠক তাঁর

লেখার সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। যে লেখকের এই সব গুণ রয়েছে, তিনি নিশ্চয় আমাদের সাহিত্যকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নেবেন। তাঁর কলমের আঁচড়ে অনেকখানি সমৃদ্ধ হবে বাংলা ছোটগল্প।
মুম রহমানকে অভিনন্দন।

ইমদাদুল হক মিলন
ঢাকা ২০১২

গল্পসূচি

সর্বংসহা ১৩
শিকার ২২
অভিসার ৩৩
মৃত্যুর রং ৪৩
কুকুর-জন্ম ৪৯
নীল শাড়ি ৫৫
সুযোগ ৬৩
ইলেকট্রিক করাতকল ৬৯
খুন ৭১
পালকের গল্প ৭২
চারটি চিঠি ৭৩
গাছ-পাখি-জল ৭৭
মড়া পাগলা ৮০

সর্বংসহা

Social science affirms that a woman's place in society
marks the level of civilization.

– এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন (১৮১৫-১৯০২), মার্কিন সমাজকর্মী এবং
প্রথমকালের অন্যতম নারীবাদী নেত্রী।

ভুলুর একটু ঝিমুনিমতো এসেছিল। বাসি ভাত খেলেই অমন হয়।

এমন সময় দরজা খুলে গেল। চতুর্থ খদ্দেরটি বেরিয়ে গেল। ভুলু একবার লেজ নেড়ে চেনা খদ্দেরকে তার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিল।

নুরানী তখনো ব্লাউজের বোতাম লাগাতে পারেনি। ভুলু ছুটে এল। সোজা নুরানীর গাল চাটতে লাগল।

আরে রাখ, রাখ, তোরও দেখি কেবল খাই খাই। ছি, চেটেপুটে ভিজিয়ে দিয়েছিস একদম।

প্রিয় নুরানীর আল্লাদী ধমক ভালোই লাগে ভুলুর।

এ পাড়ায় তখন সবে এসেছিল নুরানী, তখনো তার নাম নুরানী হয়নি। প্রতিদিন তার ওপর চলত অকথ্য সব নির্যাতন। কোত্থেকে তখন কে জানে দরজা খোলা পেয়েই রাস্তার কুকুরছানাটি সোজা নুরানীর বুকে এসেছিল। নুরানী তাকে নিজের ভাগের পাউরুটি খেতে দিয়েছিল। সেই রাস্তার ভুলু আজ নুরানীর অন্যতম রক্ষক। গেটে তার পাহারা সদা জাগ্রত। বাঁধা খদ্দের ছাড়া অন্য কারো আওয়াজ পেলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে ভুলু। ভুলু জানে, নিজের স্বামী রুবেলের চেয়ে বেশি তাকে ভরসা করে নুরানী। রুবেলের মতো ভুলুকে সস্তায় কেনা যায় না, কিংবা হয়তো কেনাই যায় না মোটেও।

নুরানীর তথাকথিত স্বামী রুবেলকে এক বোতল না, আধা বোতল মদ দিয়েই কেনা যায় যখন-তখন। দিনের মধ্যে ১৮ ঘণ্টাই সে থাকে মদের ঘোরে, বাকি ৬ ঘণ্টা ঘুমায়। তবে মানুষ হলেও রুবেলের ঘ্রাণশক্তি ভুলুর

মতোই তীব্র। ঘরে কোনো খদ্দের মদের বোতল খুললে সে দরজার বাইরে থেকে স্রেফ ঘ্রাণ নিয়ে বলে দিতে পারে জিনিসটা জরিনা না চোলাই। আর হিসাবে খুব কড়া রুবেল। ভুলু বসে থাকে দরজার সামনেই। আর রুবেল বসে থাকে রাস্তার উল্টো পাশে। সেখান থেকেই সে সজাগ দৃষ্টি রাখে নুরানীর দিকে। যতই মাল খেয়ে টাল হয়ে থাকুক, ঠিকই হিসাব রাখে দিনে কয়টা খদ্দের এল-গেল এ ঘরে। মদের ঘোরেই হোক আর ঘুমের ঘোরেই হোক, নুরানী যে তার সম্পত্তি, এইটা সে ভোলে না।

ভুলুর আহ্লাদ শেষ না হতেই ঘরে ঢোকে রুবেল। ভুলু ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। রুবেল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। ইচ্ছা করে কষে একটা লাথি দিতে। সে কিছুতেই ভুলুকে সইতে পারে না। ভুলু সেই ছোট্টবেলা থেকেই রুবেলের অনেক লাথি খেয়েছে এবং মুখ বুজে হজম করে গেছে। এখন অবশ্য লাথি দিতে ভয় পায় রুবেল। ভুলু বোঝে তার প্রিয় নুরানী কোনো এক বিচিত্র কারণেই এই বদখত লোকটাকে পোষে। অবশ্যই প্রয়োজনে রুবেলের গলার তারগুলো ছিঁড়ে দিতে ভুলুর বাধবে না। কিন্তু নুরানীর স্বামী বলেই হয়তো এখনো ভুলু সংযম দেখিয়ে যাচ্ছে। নইলে...

রুবেল ঘরে ঢুকেই নুরানীকে জেরা করে।

কত টাকা হলো?

তাতে তোর কী এল-গেল! আবার শুদ্ধ ভাষা মারাচ্ছিস!

মনে মনে ভুলু বলে, বাহ্, বেশ! নুরানীর এই সাহসটা তার বরাবরই ভালো লাগে। নুরানী জানে কখন শান্ত স্রোতে কথা বলতে হবে আর কখনই-বা উদ্দাম ঢেউয়ের মতো কথার থাপ্পড় ঝেড়ে দিতে হবে। কিন্তু নুরানীর এই ঝাঁজটা ভালো লাগে না রুবেলের। সে টাল সামলাতে সামলাতে বলে, না না, নুরানী সোনা, না, তুইতোকারি করে না। আগেও মানা করেছি সোনা, এবার কথা না-শুনলে মেরে থোতা মুখ ভোঁতা করে দেব।

শেষের বাক্যটার মধ্যে সাপের হিসহিসানি ছিল। নুরানী চোখের কোনা দিয়ে দেখে নেয় ভুলু আছে কি না কাছে। আছে, প্রিয় ভুলু বিছানার পাশেই আছে। অতএব, নুরানী নির্ভীক। কিন্তু এই সময়ই বাইরে আওয়াজ শোনা যায়।

আবার কী হলো!

কে জানে, কোন ইসের ছেলে, কী ঘোঁট পাকাচ্ছে, দাঁড়া দেখি...

থাক, তোমার আর দেখা লাগবে না, এসো, রাত অনেক হলো, শুয়ে পড়া যাক।

আজ মনে হচ্ছে তোর কাছে শুতে দিবি...

ওরে আমার নাগর, একটু আগে না বললি তুইতোকারি তোর পছন্দ না।

রুবেলের এই ছেঁচড়া রূপটায় মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ভুলুর। ঘেন্না লাগে তার, রুবেলকে নুরানীর পাশে শুতে দেখলেই ঘেন্না লাগে ভুলুর। বিরক্ত হয়ে সে বেরিয়ে যায়। আর ঠিক তখনই দরজার একটা লম্বা ছায়া দেখা যায়। দরজাটা লাগাতে ভুলে গেছে রুবেল। দরজায় চেনা গন্ধ দেখে মনে মনে খুশিই হয় ভুলু। অন্তত আজ তার প্রিয় নুরানীকে রুবেলের সাথে রাত কাটাতে হবে না।

এদিকে মুহূর্তে মদ আর মিলনের ঘোর কেটে যায় রুবেলের মগজ থেকে।

শালা, কোন...

একটা গালি দিয়ে সে দরজার দিকে আগায়। যত জোরে আর যত রাগে সে এগিয়েছিল, তার চেয়ে দ্রুত আর তার চেয়েও নরম হয়ে সে দাঁত বের করে হাসতে থাকে।

আরে, মুরব্বি যে, আসেন, আসেন, আপনে এত রাইতে...

ফিরোজকে মুরব্বি বলেই ডাকে রুবেল। এমন নয় যে বয়সে ফিরোজ তার বড়, বরং দুয়েক বছরের ছোট তো হবেই, এটা বরং সম্মানের ডাক। এই অঞ্চলের সবাই অবশ্য ফিরোজকে ফুর্তি ফিরোজ বলে ডাকে। সবাই জানে, ফিরোজ যেখানেই যাক, সেখানেই গান বাজনা, মদ, মেয়ের জমজমাট আসর বসে। তার জীবনে আনন্দফুর্তির কোনো শেষ নেই। এমনকি দুর্মুখেরা বলে, ফিরোজ নাকি কাউকে গুলি করার সময়ও মুচকি মুচকি হাসে। ফিরোজের ডান হাত ব্যাইক্কা-বাবু বলে, মানুষ এমুনভাবে চলে যে, তাগোর ভাবেচক্করে মুনে অয়, তারা অমর, মাইনে কুনু দিন মরব না! কিন্তুক আমার ওস্তাদের সামনে পড়লে সক্কলেই সিধা আজরাইলের হাত-পাও দেখতে পায়। তাই আমার ওস্তাদে মুচকি মুচকি হাইসা মনে করায়া দেয়, দেখ, তোরেও মরতে অইবো অখন।

রুবেল, ভালো আছ?

জি মুরব্বি, আপনের দোয়া, যান, ডাইরেক্ট ভেতরে যান।

ফিরোজ বাম হাত দিয়ে ভুলুর মাথায়ও একটু আদর করে দেয়। ভুলু খুশি, সে জানে আজ তার খাবারে নির্ঘাত একটা পাউরুটি জুটবে। পাউরুটি তার খুবই প্রিয়। ভুলু লেজ নাড়তে থাকে, কিন্তু রুবেলের ভেতরটায় একটা কষ্টের ফিকা কৃমি পাক খায়। সে বড় আশা করেছিল, আজ নুরানীর পাশে শোবে। সারা দিন যতই খদ্দের সামাল দিক, রাতের বিছানায় সে নুরানীর স্বামী। দিনের খাটাখাটুনির শেষে রুবেলের গায়ের ওপরই হাত-পা তুলে দিয়ে

নুরানী ঘুমায়। তখন মাঝে মাঝেই সে ভাবে, নুরানীকে নিয়ে একদিন কোথাও চলে যাবে। দুজনে অন্য কোনো জীবন খুঁজে নেবে। যদিও এসব ভাবনা সূর্যের আলোতে ঝলসে যায়, তবু রাতের দুর্লভ নির্জনতায় রুবেলের মনে হয়, আহা, নুরানী যদি দিনে-রাতে শুধুই তার হতো!

ফিরোজের গলার স্বর অথবা ভুলুর ডাকেই ভেতরের ঘর থেকে আঁচল সামলাতে সামলাতে নুরানী বেরিয়ে আসে।

ফিরোজ ভাই, আপনে!

কেমন আছ, রানী?

যান, আপনে ভেতরে বসেন। এই, তুমি একটু শোনো।

ফিরোজ ভেতরের ঘরে যায়, আর নুরানী রুবেলকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে বলে, তুমি একটু বাইরে যাও না, রাগ করবা? বুঝতেই তো পারতেছ...

রুবেল সবই বোঝে। এ পাড়াতেই তার জন্ম। তবু ফিরোজের মুখে 'রানী' ডাকটা তার কাছে চিরতার রস মনে হয়। আর রুবেলের তিতা মুখ দেখতে ভুলুর বড়ই আরাম লাগে। নুরানী কয়েক ঘণ্টার জন্য টাকা দিয়ে যারই হোক না কেন, তাতে তার কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু রুবেল চিরতরে নুরানীকে আগলে রাখবে, এটা ভাবলেই ভুলুর পেটের মধ্যে রাগ খলবল করে।

এই টাকা কয়টা রাখো। যাও, সোনা, লক্ষ্মী আমার!

পাঁচ শ টাকার একটা কড়কড়া নোট রুবেলের হাতে গুঁজে দেয় নুরানী। রুবেলের মনটা মুহূর্তেই নতুন নোটের গন্ধে নেচে ওঠে। জরিনার বোতল তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে যায় সে।

ভুলু, গেলাম, খেয়াল রাখিস, বলেই রুবেল চকিতে বেরিয়ে যায়।

এহ্, আমারে কওয়া লাগব, জীবনভর নুরানীর খেয়াল তো আমি রাখুম, তোরা তো সব বেজন্মার বাচ্চা। দায়দায়িত্ব তো আমার কাঁধেই, ঘেউ ঘেউ করে বলে ভুলু।

ভাগ্যিস ভুলুর মনের কথা বুঝতে পারে না কেউ। না, নুরানী অবশ্য তাকে বোঝে। ভুলুর মাথায় হাত বুলিয়ে নুরানী বলে, যাও, ভুলু সোনা, দরজার সামনে যাও।

দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ভুলু বেরিয়ে যায়। একাগ্র হয়ে দরজায় বসে থাকে। কিন্তু নুরানী দরজা লাগালেও ভুলুর নাক-কান রয়ে যায় ঘরের ভেতরেই। সে ভেতরের প্রতিটি কথা শুনতে পায়, বুঝতে পায়।

যেমন ভুলু বুঝতে পারে এখন ভেতরের ঘরে ফিরোজ শার্ট খুলে ফেলেছে। তার ঘামে ভেজা গেঞ্জি থেকে কড়া গন্ধ আসে।

এই শীতে এত ঘামছেন যে, ভাই!

তুমি আমার কোন মায়ের পেটের বোন, এত ভাই ভাই করো ক্যান!

নিজের ইয়ার্কিতে নিজেই ছাদ ফাটিয়ে হাসতে থাকে ফিরোজ। রাতের নির্জনতা চিরে সে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। দরজার ওপারে ভুলু চমকে ওঠে ঘেউ ঘেউ করে জানিয়ে দেয়, আস্তে, হাসাহাসি আস্তে!

তোমার এই কুত্তাটারে একদিন গুলি কইরা মারা দরকার, খামাখাই ঘেউ ঘেউ করে। কবেই যে গুলি করতাম, কেবল কুত্তা মাইরা পিস্তল কালা করতে চাই না বইলাই করি না।

আবার নিজের ইয়ার্কিতে বেমক্কা হাসতে থাকে ফুর্তিবাজ ফিরোজ। ভুলুও ঘেউ ঘেউ করে জানিয়ে দেয়, সুযোগ পেলে সে-ও কাউকে ছেড়ে কথা কইবে না।

তোমার কুত্তাটা তোমারে বহুত মহব্বত করে আর আমাগোরে সতিন মনে করে। এই কুত্তার লগে তোমার নিশ্চয়ই...

বলেই ফিরোজ আবার হাসতে থাকে। নুরানী সে হাসিতে তাল দেয়। খদ্দেরের হাসি-কান্নায় তাকে তাল ঠুকতে হয়। এই তো নিয়ম।

কী গো রানী, দূরে দূরেই থাকবা, নাকি দাওয়াত দিয়া কাছে আনতে হইব। শোনো, সারা শরীরে জব্বর ব্যথা। সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিবা কোথা...

আবার একপশলা হাসে ফিরোজ।

নির্ঘাত আজ রাতে তার মাথায় খুন সওয়ার হয়েছে, নইলে কথায় কথায় এত হাসির বন্যা ছুটত না, ভাবে ভুলু। ভুলুর কেবলই মনে হয়, কী যেন ঘটবে আজ, বাতাসে কেমন অচেনা গন্ধ! সে শুনতে পায় ফিরোজ বলছে, বুঝলা রানী, শরীরটায় বিষ-ব্যথা। ম্যাসেজ-মুসেজ পারোনি, ব্যাঙ্ককের মাইয়াগুলা কী যে ভালো পারে এই সব কাজ। না না, তুমি আবার গোসসা কইরো না যেন, তুমি কি তাদের চেয়ে কম!

তা-ই...

বিছানার পাশে বসতে বসতেই ফিরোজের পা'টা কোলে টেনে নেয় নুরানী। দুহাতের তালু আর আঙুলে যতটা কুলায়, ততটা আদর আর মোচড় দিতে থাকে নুরানী। আরামে ফিরোজের চোখ বুজে যায়। আদুরে গলায় সে বলে, লাইট নিভিয়ে দেও। এসব মুহূর্তে আলো ভালো লাগে না তার।

আলো নিভে যায়। কিন্তু ভুলুর জন্য আলো-অন্ধকার সমান। সে নাক-কান দিয়েই দুনিয়া দেখতে পায়। সে অনুভব করে, ভেতরে আদিম উল্লাসে

মেতে ওঠে আদম-হাওয়ার জাত। অন্ধকার আর নির্জনতায় কেবল কিছু অগ্রন্থিত ধ্বনির পদচারণ চলতে থাকে। পরিযায়ী পাখির মতো সময় ভাসতে থাকে। দরজার বাইরে কেবল ভুলুর গোঙানি বাড়ে। ঘরের ভেতরের হুটোপুটিও একদা শেষ হয়। শিশুর মতো নুরানীর বুকে মুখ লেপটে রাখে ফিরোজ। পেশাদার আদরের শেষে এখন সে ক্লান্ত আর ঘুমকাতর।

আর তখনই ভুলু দেখে, এগিয়ে আসছে সবুর দারোগা। এত রাতে এই ব্যাটা এইখানে কী চায়! সে তো সচরাচর আসে না এখানে। ভুলু ঘেউ ঘেউ করে নুরানীকে সতর্ক করে দেয়। সবুর দারোগা কষে একটা লাথি দেয় ভুলুকে। ভুলু সে লাথি হজম করে। সে দেখেছে পুলিশের লাথি এখানকার সবাই হজম করে নেয়। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হারামি লোকটাও পুলিশরে মানে।

ভুলুর আওয়াজে নুরানী ঠিকই বুঝতে পারে বাইরে কিছু ঘটছে। ততক্ষণে ফিরোজও বোঝে কেউ একজন দরজা ঠুকছে।

রুবেল?

না, তার তো এখন আসার কথা না! পুরা পাঁচ শ টাকা দিছি।

তাইলে?

বলেই বালিশের পাশে রাখা কালো যন্ত্রটা তুলে নেয় ফিরোজ।

আহা, ওইটা রাখেন। আমি দেখি কে? এক কাজ করেন, আপনে বাথরুমে ঢোকেন।

ফিরোজ বাধ্য ছেলের মতো আদেশ মেনে নেয়। মেঝে থেকে শার্টটা তুলে সে বাথরুমে ঢুকে যায়। দরজায় অস্থির কড়া নাড়া বাড়ে। না, কড়া নাড়া নয়, কে যেন লাঠি দিয়ে দরজা পেটাচ্ছে।

কেডা?

খোলো, আমি সবুর।

অতএব দরজা খুলতে বাধ্য হয় নুরানী। সবুর দারোগার পেছন থেকেই উঁকি দিচ্ছে ভুলু। সে কেমন অস্থির পাক খায়। নুরানী কোনো একটা ঝামেলার গন্ধ পায়।

এত রাইতেও খদ্দের আছে নাকি ঘরে?

না, জি না। আপনে, এমুন সময়?

ঘরে ঢুকতে দিবা, নাকি দরজা থাইকাই বিদায় জানাবা?

না না, আসেন, ভেতরে আসেন।

বাধ্য হয়ে সবুরকে ভেতরে ডাকে নুরানী। সবুর দারোগা সচরাচর আসে না এদিকে। মাসে-দুমাসে একদিন, কখনো তা-ও না। বখরা চলে যায় নিয়ম

মতোই। আসার দরকার তেমন পড়ে না, স্রেফ হঠাৎ ঘরের বউকে পানসে মনে হলে নুরানীর কাছে সে চলে আসে। আর কারো কাছে যায় না, শুধু নুরানীর কাছেই আসে।

বুঝলা, আইজ এক হারামজাদা বহুত ভুগাইছে। একটুর জন্য ধরতে পারি নাই।

বিরক্ত সবুর নিজেকে বিছানায় ছুড়ে দেয়।

বাত্তি জ্বালাও, তোমারে একটু দেখি। বহুত দিন তোমারে দেখি না।

আচমকা আলোতে নুরানীর চোখ পিটপিট করে। বিছানার চাদরে তখনো বলিরেখা ফুটে আছে।

কী, ঘরে কেউ আছিল নাকি?

না না, কেউ না।

বিছানা তো গরম দেখি! তা রুবেল মিয়া কই?

একটা প্রশ্নেই নুরানী বুঝে যায় তাকে কী করতে হবে। কিন্তু নিজেকে স্থির রাখে সে। স্রেফ ভুলুর সঙ্গে একটা চোখাচোখি হয়।

আপনে কি জেরা করতে আইছেন?

ওই দেখো, জেরা করব ক্যান? জানতে চাইলাম আরকি? ক্যান আইছি, সেইটা তো বুঝতেই পারছ? নাকি পারো নাই?

পারছি। কিছু মনে না করলে আপনে একটু ওই ঘরে বইতেন, আমি একটু গুছায়া লইতাম।

বা বা, স্পেশাল কিছু করবা মনে হয়। ভেরি গুড।

জি!

না, আমি বসতেছি ওই ঘরে, তুমি বরং নিজেরে গুছায়ামুছায়া লও।

সবুর দারোগার মনে আনন্দই লাগে। নুরানীর আলাদা একটা রুচি আছে। এই কারণেই সে তার কাছে আসে। সারা দিন আজ যে অবর্ণনীয় খাটুনি গেছে, তা মেটাতেই এখানে আসা। এখন শুধু তার আগমনেই নুরানী নিজেকে সাজাবে-গোছাবে ভাবতেই তার ভালো লাগে। আয়েশ করে সে একটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ ধরায়। ধোঁয়াগুলো পাক খেয়ে খেয়ে এলোমেলো ঘুরতে থাকে। সিগারেটের ধোঁয়া দেখার মধ্যেও বুঝি একটা নেশা আছে। নিজের ফুঁকে দেওয়া ধোঁয়াগুলো নিবিষ্ট মনে দেখতে থাকে সবুর দারোগা।

গুটি গুটি পায়ে ভুলু এগিয়ে আসে সবুর দারোগার কাছাকাছি।

কি রে, আরেকটা লাত্থি খাবি?

ঘেউ ঘেউ!

অকস্মাৎ কিছু বোঝার আগেই কে যেন লাফ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ভেতরের ঘর থেকে বের হয়েই সোজা বাইরের দরজায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইরে থেকে ঠাস করে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দেয় বেরিয়ে যাওয়া লোকটা। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে যায় সবুর। কয়েক সেকেন্ড পরই তার মাথায় ম্যাজিকের মতো একটা নাম চলে আসে। সে একাই বিস্মিত হয়ে বলে, ফিরোজ!

আর তখনই দরজার বাইরে থেকে ফিরোজ কথা বলে ওঠে, সবুর ভাই, আসি, দোয়া রাখবেন। নিজের বিখ্যাত আকাশফাটানো হাসি দিয়ে সে মিলিয়ে যায়। সবুর আক্রোশে ভেতর থেকে দরজায় লাথি দিতে থাকে। দরজা ককিয়ে ওঠে, কিন্তু খোলে না, ভেতরে ভুলু ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। রাগের মাথায় ভুলুকে আরেকটা লাথি দেয় সবুর।

খামাখা ওরে লাইত্থাইতাছেন ক্যা!

ফিরোজ হারামজাদা তোমার এইখানে লুকাই ছিল? তুমি তারে ঠাঁই দিছ।

আমি তো সবাইরেই ঠাঁই দেই। আসেন, ভেতরে আসেন। আমি রেডি।

ভেতরে, তোমারে আমি চৌদ্দ শিকের ভেতরে নিয়া যামু। আমার সাথে চিটিংবাজি, তোমার এত সাহস। সবুর দারোগার সাথে হারামিপনা করো! আমি যে কত হারামি, সেইটা দেখামু তোমারে!

হুদাই রাগ দেখায়েন না, স্যার। আমরা তো কাউরে ফিরায়ে দেই না, আপনে আসলেও হ্যাঁ, উনি আসলেও হ্যাঁ। সবাই আমাগোর ধরাছোঁয়ার মধ্যে।

অই, আমি আর ওই এক হইলাম? একটা গুন্ডা-বদমাইশ আর পুলিশ এক হইল? এক্ষণ দরজা খোলার ব্যবস্থা করো, নইলে বাইড়াইয়া সব ভাইঙ্গা ফালামু।

আর কত ভাঙবেন, নদীর দুই পাড়ের মতো ভাঙতে ভাঙতেই তো এইহানে আসা। আমার এই শরীরটাও একটা নদী হয়া গেছে। গাঙ, বিরাট গাঙ। গাঙ বোঝেন, স্যার? এই গাঙ থাইকা যার ইচ্ছা বদনা ভইরা পানি নেয়। কেউ হাগার পানি নেয়, কেউ অজুর পানি নেয়। আমি পানি দিতে থাকি। আর ভাঙতে থাকি। এইপার-ওইপার–সব ভাঙা আমার। আমারে কি ভাঙনের ডর দেহান, স্যার?

জ্ঞান ঠাপাও? পুলিশের লাঠির ঠাপ কেমুন বুঝামু তোমারে। এমুন শিক্ষা দিমু...